



(২১) আল্লাহ লিখে দিয়েছেন : আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশ্বর, পরাক্রমশালী। (২২) যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ইমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথ্য চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।

সূরা আল-হাজর

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ২৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু।

(১) নাভেমগল ও ভূমগলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিস্কার করেছেন। তোমরা খরশাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমনদিক থেকে আসল, যার কম্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতঃপর, হে চক্ষুমান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৩) আল্লাহ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

দুশমন। যার অন্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহবত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহবত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফেরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাহী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

কাফেরদের সাথে সদ্যব্যবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এগুলো কাফেরদের সাথেও করা জায়েয। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্যে ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্যেও ক্ষতিকর না হয়।

وَيَحْيُونَ عَلَى الْكُذُوبِ -কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, এই

আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও আবদুল্লাহ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন : এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ ; দেহবয়ব বেঁটে গোধূম বর্ণ এবং সে ছিল হালকা শূশ্রমণ্ডিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন : তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন ? সে শপথ করে বলল : আমি একরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন। (কুরতুবী)

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব কাফেরের সাথে হতে পারে না :

لَيْدٌ قَوْمًا يُؤَيُّونُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَذُونَ مِنْ حَادِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَوْ

..... كَانُوا آبَاءَهُمْ
সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আল্লাহর গযব ও কঠোর শাস্তির বর্ণনা ছিল। এই আয়াতে তাদের বিপরীতে ঋাটি মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফের তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয়।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সবারই এই অবস্থা ছিল। এস্থলে তফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে সব সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন।

মাসআলা : পাপাসক্ত ফাসেক-ফাজের ও কার্যতঃ ধর্মবিমুখ মুসলমানদের বেলায়ও অনেক ফেকাহবিদ এই বিধান রেখেছেন যে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হতে পারে না। কাজকর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা প্রয়োজন মাফিক সাহচর্য ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিস্ক তথা পাপাসক্তির বীজানু বিদ্যমান

আছে, একমাত্র তার অন্তরেই কোন ফাসেক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকতে পারে। তাই রসূলে খোদা (সাঃ) তাঁর দোয়ায় বলতেন : لا تجعل لفاجر على يدا. অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমাকে কোন পাপাসক্ত ব্যক্তির কাছে ঋণী করো না। অর্থাৎ, তার কোন অনুগ্রহ যেন আমার উপর না থাকে। কেননা, সম্প্রস্তু মানুষ স্বভাবগত গুণের কারণে অনুগ্রহকারীর প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখতে বাধ্য হয়। কাজেই ফাসেকদের অনুগ্রহ কবুল করা তাদের প্রতি মহব্বতের সেতু। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সেতু নির্মাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।—(কুরতুবী)

وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَأَعْتَدُوا لَهُمُ الْعَذَابَ—এখানে কেউ কেউ রাহ-এর তফসীর করেছেন

নূর, যা মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সংকর্ষ ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রাহ-এর তফসীর করেছেন কোরআন ও কোরআনের প্রশংসা। কারণ, এটাই মুমিনের আসল শক্তি।—(কুরতুবী)

সূরা আল-হাশর

বোগসত্র ও শানে নুযুল : পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিক ও ইহুদীদের বন্ধুত্বের নিন্দা করা হয়েছিল। এই সূরায় ইহুদীদের দুনিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের বৃথাশ্রু এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এক গোত্র ছিল বনু-নুযায়ের। তারাও শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমার ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাও সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলমান-ইহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি বনু-নুযায়ের গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল : আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা পোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তাঁর উপর ছেড়ে দিবে, যাতে তাঁর ভবলীলা সাজ হয়ে যায়। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সেস্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বলে পাঠালেন : তোমরা অস্বীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লঙ্ঘন করো। অতঃপর, তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এখানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। বনু-নুযায়ের মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল : তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দিবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দিবে না। রহুল-মা'আনীতে আছে, এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে-মালেক, মুয়ায়েদ এবং

রায়েসও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর সাথে শরীক ছিল। বনু-নুযায়ের তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সদর্পে বলে পাঠাল : আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেলামকে সাথে নিয়ে বনু-নুযায়ের গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনু-নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খজুর বৃক্ষে আশ্রয় ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোন অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবেনা। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সে মতে বনু-নুযায়েরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খয়বরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি-কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদীর সাথে খয়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদুইই 'প্রথম সমাবেশ' ও 'দ্বিতীয় সমাবেশ' নামে অভিহিত।—(যাদুল মা'আদ)

সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনু-নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস : সমগ্র সূরা হাশর ইহুদী বনু-নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।—(ইবনে-ইসহাক) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সূরার নামই 'সূরা বনু-নুযায়ের' বলতেন।—(ইবনে কাসীর) বনু-নুযায়ের হযরত হারুন (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইহুদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তওরাতে খাতামুল আশ্বিয়া মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সংবাদ, আকার-অবয়ব ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লেখিত আছে। এই পরিবার শেযনবী (সাঃ)-এর সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক তওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেযনবী (সাঃ) কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেযনবী হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেযনবী গেরিত হয়েছেন বনী-ইসরাঈলের পরিবারে বনী-ইসরাঈলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেযনবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল, কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চিনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বলভিত্তি। ফলে ওহুদ যুদ্ধের প্রথমদিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টলটলায়মান হয়ে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল।

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা পৌছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা

আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শাস্তিচুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। 'সীরত ইবনে-হেশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনভাবে বনু-নুযায়েরসহ ইহুদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনু-নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগ-বাগিচা ছিল।

ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যতঃ এই শাস্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দূরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনু-নুযায়েরের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে-আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশ জন ইহুদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহুদ যুদ্ধ ফেরত কোরায়শী কাফেরদের সাথে সাক্ষাত করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশ জন ইহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চল্লিশ জন কোরায়শী নেতাসহ কাবা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহর গেলাফ স্পর্শকরতঃ পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে-আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং মুহাম্মদ ইবনে-মাসলামা (রাঃ) সাহাবী তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনু-নুযায়েরের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি উপরে শানে-নুযুলে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা, যে গৃহের নীচে তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বসিয়েছিল, তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারী পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওমর ইবনে-জাহ্‌হাশ, আল্লাহ তাআলার হেফাযতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা : শানে-নুযুলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই হত্যাকাণ্ডের রক্ত বিনিময় সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারেই বনু-নুযায়েরের চাঁদা লাভ করার জন্যে তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর লিখেন : মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের কাহিনী অতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের

ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছু সংখ্যক মুনাফিক ও কাফের তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তর জন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা চক্রান্ত ছিল। কাফেরেরা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমীর কোনরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এইমাত্র কাফেরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর উনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফেরদের মোকাবেলায় তাঁর মনোবৃত্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তিনি দুইজন কাফেরের মুখোমুখি হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যাকরেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী-আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শাস্তিচুক্তি ছিল।

لَاؤِلِ الْمَثَرِ - বনু-নুযায়েরের এই নির্বাসনকে কোরআন পাক

'আউয়ালে হাশর' তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা একজায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল। এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যস্বাভাবী ছিল। এটা হযরত ফারুকে আযম (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বাস্তবরূপে পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খয়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এদিক দিয়ে বনু-নুযায়েরের এই নির্বাসন, প্রথম সমাবেশ এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন, দ্বিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।

فَأْتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا - এর শাব্দিক অর্থ এই যে,

আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলাবাহুল্য, আল্লাহর আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

يُجْرُونَ بِرَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ أَلْفَيْنًا - গৃহের দরজা, কপাট

ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।



(৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাজ্জিত করেন। (৬) আল্লাহ বনু-বনুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৭) আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাকিরদের জন্যে, যাতে ধনেশ্বর কেবল তোমাদের বিস্ত্রশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অনুরোধে এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিঃস্বদের বাস্তবতা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। (৯) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষানোষণ করে না এবং নিঃস্বের অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কাপণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ نَرْتَمْتُمْهَا قِوَامًا عَلَىٰ أَصُولِهَا فَيَادْنِ اللَّهُ

শব্দের অর্থ খজুর বৃক্ষ। বনু-নুযায়রের খজুর বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভিতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্যে তাদের কিছু খজুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে খতম করে দিলেন। অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ বিজয় তাদের হবে এবং পনিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল। এতে উভয়দলের কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

শব্দটি *فِي* থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও *فِي* বলা হয়। কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের স্বরূপ এই যে, কাফেররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনে শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধন-সম্পদকেই *فِي* বলা হত। কিন্তু যুদ্ধ ও জেহাদের মাধ্যমে যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধন-সম্পদকে 'গনীমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
কিন্তু যে ধন-সম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও জেহাদের প্রয়োজন পড়ে না, তাকে *فِي* শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধন-সম্পদ যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বন্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন দেবেন, অথবা নিজের জন্যে রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বন্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছেঃ

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

এখানে *أَهْلِ الْقُرَىٰ* বলে বনু-নুযায়ের এবং তাদের মত বনু-কোরাযযা ইত্যাদি গোত্র বোঝানো হয়েছে, যাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার ধন-সম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বন্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের শুরুতে গনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জেহাদের ফলশ্রুতিতে যে ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল

এবং যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফেররা যে ধন-সম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে জিয়ায়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

كُلٌّ لَا يَكُونُ ذُوْلَةً بَيْنَ الْأَعْيُنِ وَمِنْهُ —যে সম্পদ পরস্পরে আদান-প্রদান হয়, তাকে ذُوْلَةٌ বলা হয়।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই যে, উপরোক্ত ধন-সম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিস্তাশালীদের মধ্যকার পৃষ্ঠীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মুখ্‌তাযুগের একটি কুপ্রথার মূলোৎপাটনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিস্তাশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃশব্দ ও দরিদ্রদের কোন অংশ থাকত না।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

—এই আয়াত ফায়-এর মাল বন্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায় এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা হকদারদের শ্রেণী বর্ণনা করেছেন ঠিক, কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে যে পরিমাণ দেন, তা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না। অতঃপর وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ছলচাতুরীর মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আল্লাহ তাআলা সব খবর রাখেন। তিনি এজন্যে শাস্তি দেবেন।

রসুলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয় : কিন্তু আয়াতের ভাষা ধন-সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরীয়তের বিশি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপকভঙ্গিতে আয়াতের এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা ধন-সম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী কাজ করতে সন্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কেবলমাত্র আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন। কুরতুবী বলেন : আয়াতে كُلٌّ শব্দে বিপরীতে نَهَى শব্দ ব্যবহার করায় বোঝা যায় যে, এখানে كُلٌّ শব্দের অর্থ كَمْرٌ অর্থাৎ, যা আদেশ করেন। কারণ এটাই نَهَى এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে كُلٌّ শব্দ এজন্যে ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়' এর মাল বন্টন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুও এতে शामिल থাকে। কারণ, এ প্রসঙ্গে আয়াতটি আনা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে এহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বলল : আপনি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত বলতে পারেন কি যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেন : হাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে অতঃপর তিনি وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ আয়াতটি পাঠ করে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী একবার উপস্থিত লোকজনকে বললেন : আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর, যা জিজ্ঞাসা

করতে চাও। এক ব্যক্তি আরয করল : এক ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় প্রজ্ঞাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।—(কুরতুবী)।

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

—রুক্কর শেষ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র মুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উম্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাকরণিক দিক দিয়ে لِفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ থেকে بدل হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে।—(মাযহরী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণতঃ এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ, তাঁদের ধর্মীয় খেদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَمْلِكُونَ أَمْوَالَهُمْ

يَتَّبِعُونَ فُضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيُضَرِّقُونَ اللَّهُ وَرِضْوَانًا أُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায়সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর সমর্থক ও সাহায্যকারী শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফেররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধন-সম্পদ ও বাস্তু-ভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীত বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আত্মরক্ষা করতেন।—(মাযহরী, কুরতুবী)।

يَتَّبِعُونَ فُضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

অর্থাৎ, তাঁরা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেননি; কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। فُضْلٌ শব্দটি প্রায়শঃ পার্শ্ববর্তী নৈয়ামতের জন্যে এবং رِضْوَانٌ শব্দটি পারলৌকিক নৈয়ামতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নৈয়ামত কামনা করছেন।

وَيُضَرِّقُونَ اللَّهُ وَرِضْوَانًا

অর্থাৎ, আল্লাহ ও রসুলকে সাহায্য করার জন্যে তাঁর উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহ তাআলাকে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও তীতিক্ষা বিশ্ময়কর।

أُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ —অর্থাৎ, তাঁরাই

কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ তাআলা ও রসুলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে

পারে না। নাউমুল্লাহ্! রাফেযী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লক্ষণ। রসূলে করীম (সাঃ) এই ফকীর মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করতেন। এতেই বোঝা যায় যে, হযূরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল।—(মাযহারী)।

আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব : **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ** শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। **دار** বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়েবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌঁছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জেহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি, মক্কা মোকাররমাও। একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুক ধারণ করেছে।—(কুরতুবী)।

আয়াতে **تَبَوَّءُوا** ক্রিয়াপদের পর **دار** এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ অবস্থান গ্রহণ কোন স্থান বা জায়গাতেই শুধু হতে পারে। ঈমান কোন জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন : এখানে **حَلَّضُوا** অথবা **فَكَانُوا** ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ইমানে ঝাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। **مِنْ قَبْلِهِمْ** অর্থাৎ, মুহাজিরগণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আল্লাহ্ তাআলার কাছে 'দারুল-হিজরত' ও দারুল ঈমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ঈমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **مُحْرَبُونَ مِنْ حَاجِرِ الْأَنْبِيَاءِ** অর্থাৎ, তাঁরা তাদেরকে ভালবাসে, যারা হিজরত করে তাদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণতঃ লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেননি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধন-সম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইযযত ও সম্প্রমের সাথে তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেয়ার জন্যে এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে এর নিশ্চিন্তি করতে হয়েছে।—(মাযহারী)।

তাঁদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে : **وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَدْيِ الْأَرْضِ** এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনু-নুবায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের

দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল।

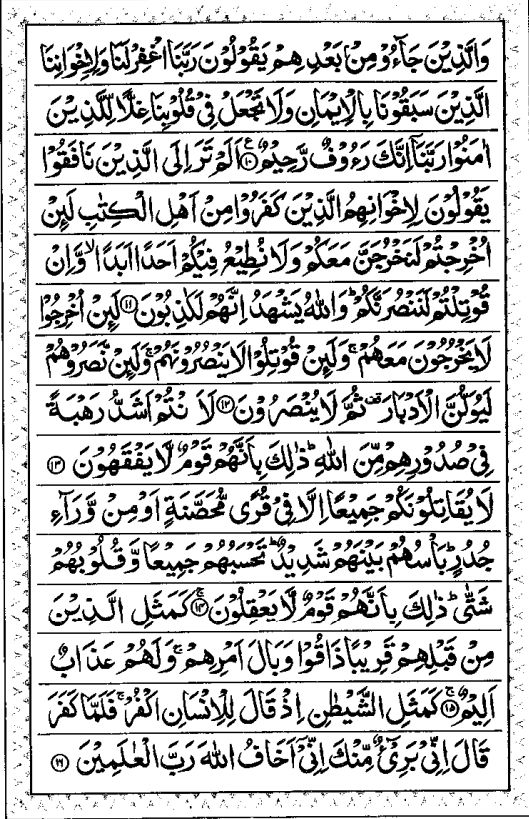
উল্লেখিত আয়াতে **حَاجَةٌ** বলে প্রয়োজনের বস্তু এবং **مِنَّا**—এর সর্বনাম দ্বারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, এই বস্তুনে যা কিছু মুহাজিরগণকে দেয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন; যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজন ছিল না। মুহাজিরগণকে দেয়াকে খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর মোকবেলায় যখন বাহরাইন বিজিত হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর প্রাপ্ত ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তাঁরা তাতে রাযী হলেন না, বরং বললেন : আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধন-সম্পদ থেকে অংশ না দেয়া হয়।—(বোখারী, ইবনে-কাসীর)।

আনসারগণের চতুর্থ গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : **وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَدْيِ الْأَرْضِ** শব্দের অর্থ দারিদ্র্য ও উপবাস। **ایشار** এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজেদের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রাধিকার রাখা। আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন; যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ছিলেন।

আনসারগণের **وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْئًا فَمَا تَكْفُرُوا**

আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্ তাআলার পথে সবকিছু বিসর্জন দেয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্ তাআলার কাছে সফলকাম। **بخل** ও **كفر** শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থক। তবে **كفر** শব্দের মধ্যে কিস্কিৎ আতিশয্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। যাকাত, ফিতরা, ওশর, কোরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্ তাআলার ওয়াজেব হক আদায়ের অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ অভাবগ্রস্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বান্দার ওয়াজেব হক আদায়ের কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কৃপণতা মুস্তাহাব বিষয় ও দান খয়রাতের ফযীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মকরহ ও নিন্দনীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরীয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কোরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্যে সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁরা কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।



(১০) আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের আত্মগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। (১১) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলে : তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বেশ সম্প্রদায়। (১৪) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন ; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাওজ্জানহীন সম্প্রদায়। (১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শান্তিভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি। (১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে : তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান : এই আয়াতের بعد অর্থে সাহাবায়ে কেরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাইকে 'ফায়'-এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেননি ; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াকফ হিসেবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানি ইসলামী বায়তুল-মালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বন্টন করে দেয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন রসুলুল্লাহ (সাঃ) খয়বরের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্যে কি অবশিষ্ট থাকবে?—(মালেক-কুরত্বী)।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালবাসা ও মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যপন্থী হওয়ার পরিচায়ক : এহলে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব এহলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানে অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে এবং সবার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যেও এরূপ দোয়া করে : আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্যে দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রাঃ) বললেন : উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ; অর্থাৎ, মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণকারী এক শ্রেণী বাকী রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোন আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে তাঁর শাহাদতের ঘটনা স্মরণিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাষ্টা প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তবে কি আনসারগণের একজন? সে বলল : না। হযরত হুসাইন (রাঃ) বললেন : এখন তৃতীয় আয়াত وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ বাকী রয়ে গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রাঃ) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও

সংশয় সৃষ্টি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণী থেকেও খারিজ হয়ে যাবে।

কুরতুবী বলেন : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের জন্যে ওয়াজেব। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন : যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের 'ফায়'-এর মালে তার কোন অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়-এর মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন : আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে-কেরামের জন্যে এস্তেগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা জানতেন যে, তাঁদের পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুখারণা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্যে জায়েয নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন : আমি তোমাদের নবী (সাঃ)-এর মুখে শুনেছি : এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভর্সনা না করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন : তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল : যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ, তার উপর আল্লাহ তাআলার লানত হোক। বলাবাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না—যে তাঁকে মন্দ বলে সে-ই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশব বলেন : এই উম্মতের পূর্ববর্তীগণ মানুষকে সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না ; করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে—(কুরতুবী)।

... كَسَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمًا... এটা বনু-নুযায়রের দৃষ্টান্ত
كَارًا؟ এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : এরা হচ্ছে বদরের কাকের যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : এরা ইহুদী বনু-কায়নুকা। উভয়েরই অশুভ পরিণতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাক্ষিত হওয়ার ঘটনা তখন জন সমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা, বনু-নুযায়রের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনু-কায়নুকাদের ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিকদের সত্তর জন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাক্ষিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, হযরত মুজাহিদ (রহঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী — دَاوُوا بِأَيِّهَا أَمْرُهُمْ — বাক্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আন্বাদন করেছে। এটা পরকালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহুদী বনু-কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বনু কায়নুকাদের নির্বাসন : রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় আগমন করার পর মদীনার পার্শ্ববর্তী সবগুলো ইহুদী গোত্রের সাথে শাস্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই যে, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের কোন শত্রুকে সাহায্য করবে না। বনু-কায়নুকাও এই শাস্তিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় قَوْمٍ خِيَانَةٌ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ

وَإِنَّمَا كَفَرْنَا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ অর্থাৎ, চুক্তি সম্পাদনের পর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের শাস্তিচুক্তি ভঙ্গ করে দিতে পারেন। বনু-কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত হামযা (রাঃ)-এর হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবুল লুবা (রাঃ)-কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জেহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনু-কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, মোকাবেলা ফলপ্রসূ হবে না। অগত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল : আমাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সিদ্ধান্ত নিবেন, আমরা তাতেই সম্মত আছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন ; কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক বাধ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাল। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করলেন : তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধন-সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা অনুযায়ী বনু-কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমরুয়াত এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের ধন-সম্পত্তি বন্টনকরতঃ একভাগ বায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তুলমালে গনীমতের পাঁচ ভাগের একভাগ জমা হল। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

... كَسَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمًا... এটা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত,
كَارًا? এটা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত, যারা বনু-নুযায়রকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোন মুনাফিক সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কোরআন পাক শয়তানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফর করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানারকম ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হল, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আল্লাহ তাআলা জানান শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কোরআনে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে :

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَلَمْ تُنظِرُوا
نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ
أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ
النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾
لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
مُتَضَعًا عَاصِرًا حَشِيمةَ اللَّهِ وَتَوَكُّاتٍ أَمثالٍ نَظَرُهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ عُلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ الْعَزِيزُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْمُنْتَكِبُ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

(১৭) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জ্বলেমদের শাস্তি। (১৮) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অব্যাহা। (২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জহ্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জহ্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে ভূমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (২৩) তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শাস্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজাময়।

وَأَذَرْتَن لَّهُمُ الشَّيْطَانَ أَحْمًا لَهُمْ وَقَالَ لَعَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ
وَإِنِّي جَارِكُمْ فَانكَبْتُمْ أَفْئَتِكُمْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ

এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার

মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদের মুসলমানদেরকে মোকাবেলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন বাস্তবিকই মোকাবেলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে।

আলাচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যতঃ কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মোকাবেলায় একত্রিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলারই অনুরূপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাশরে শুরু থেকে কিতাবী, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর, সূরার শেষ পর্যন্ত মুমিনদেরকে হুশিয়ারী ও সংকর্ম পরায়ণতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখিত প্রথম আয়াতে বলিষ্ঠভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্ঞন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ আছে। বলা হয়েছে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَلَمْ تُنظِرُوا نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ অর্থাৎ, মুমিনগণ, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের জন্যে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রাধান্যযোগ্য। এ আয়াতে কেয়ামত বোঝাতে গিয়ে لُحْدٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনিই ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথম, সমগ্র ইহকাল পরকালে মোকাবেলায় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ, এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। মানব বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।

এক হাদীসে আছে—সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আমাদের রোযা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্যে গুরুত্ববহু নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত; যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়—খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার—সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ, আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত, ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে : **من مات فقد قامت قيامته** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কায়েম হয়ে যায়। কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং আযাব ও সওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপার নাম বরখ, এটা দুনিয়ার “ওয়েটিং রুম” (বিশ্রামাগার) সদৃশ। “ওয়েটিং রুম” ফাস্ট ক্লাস থেকে নিয়ে হার্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্যে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিশ্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ তাআলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধাঁধার রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশংকা করতে থাকে যে, পরের ঘটনাটি তার জীবদ্দশায় অতিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষতঃ বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলী একে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মত নিকটবর্তী ; এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সম্ভবপর।

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ — বলে সং ও অসং উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সংকর্ম প্রেরণ করে, সে সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসংকর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর **وَأَنْتُمْ أَلِلُّوا** বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তাকীদ করা এবং অপর সম্ভাব্য কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথম **وَأَنْتُمْ أَلِلُّوا** বলে খোদায়ী নির্দেশাবলী পালন করে পরকালের জন্যে সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার **وَأَنْتُمْ أَلِلُّوا** বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যতঃ সংকর্ম, কিন্তু তা ঋণটিভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে করা হয় না ; বরং নাম-যশ অথবা কোন মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যতঃ এবাদত হলেও ধর্মে তার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে বেদআত ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, দ্বিতীয় **وَأَنْتُمْ أَلِلُّوا** বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্যে কেবল দৃশ্যতঃ সম্বল যথেষ্ট নয় ; বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

وَأَنْتُمْ أَلِلُّوا — অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভাল-মন্দের জ্ঞান

হারিয়ে ফেলেছে।

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ —এটা একটা দৃষ্টান্ত ; অর্থাৎ, যদি কোরআন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত এবং পাহাড়কে মানুষের ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দেয়া হত, তবে পাহাড়ও কোরআনের মাহাত্ম্যের সামনে নত—বরং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশী ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব, এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। কেউ কেউ বলেন : পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয়—বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত।—(মায়হারী)।

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ তাআলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দৃশ্য-অদৃশ্য ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জ্ঞানেন। **الْقُدُّوسُ** —এমনি সত্তা, যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে পবিত্র। **الْمُبِينُ** —এই শব্দটি মানুষের জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আল্লাহ ও রসুলে বিশ্বাসী। আল্লাহ তাআলার জন্যে ব্যবহার করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ, তিনি ঈমানদারণকে সর্বপ্রকার আযাব ও বিপদ থেকে শাস্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

الْمُهَيَّبُونَ —এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রহঃ) তাই বলেছেন।—(মায়হারী, কামুস)।

الْجَبَّارُ —প্রতাপশালী মহান। এই শব্দটি **جبر** থেকেও উদ্ভূত হতে পারে, যার অর্থ ভাঙা হাড় ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভাঙা হাড় জোড়া দেয়ার পর যে পট্টি বাধা হয়, তাকে **جبيره** বলা হয়। অতএব, অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও অকেজো বস্তুর সংস্কারক।—(মায়হারী)।

الْمُنَكِّرُ —এটা **تكبير** ও **كبريا** থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়ত্ব, প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার জন্যে নির্দিষ্ট। তিনি কোন বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের জন্যে এই শব্দটি দোষ ও গোনাহ। কারণ, সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবী করা মিথ্যা এবং আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণে শরীক হওয়ার দাবী। তাই এটা আল্লাহ তাআলার জন্যে পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্যে মিথ্যা দাবী।

الْمُصَوِّرُ — অর্থাৎ, রূপদানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তুর আল্লাহ তাআলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্বারা এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল সৃষ্টবস্তু বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। সৃষ্টবস্তুর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি, মানুষের একই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোটি নারী ও পুরুষের চেহারায় এমন স্বতন্ত্র যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না—এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই অপার শক্তির কারসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ত্ব যেমন আল্লাহ হ্যাঁ অন্যের